Copula: Jahangirnagar University Studies in Philosophy, Vol. XXXVII, June 2020

উপনিবেশ-পূর্ব বাংলার দর্শনঃ দেশ-কাল ও ব্যক্তির ধারণা

মো. জহির রায়হান*

[**সার-সংক্ষেপঃ** প্রাচ্যের চিন্তায় কালের ধারণা চক্রাবর্তমূলক– এমন দাবি করা হলেও উপনিবেশপূর্ব বাংলার দর্শনধারাগুলোতে কালের ধারণা নানাবিধ। যোগাচারবাদ, বৌদ্ধ সহজিয়া, মাধ্যমিকবাদ, নব্য ন্যায় দর্শন ও বাউল দর্শনে দেশ-কালের ধারণা এক রকমের নয়। দেশ-কাল সম্পর্কিত ধারণার সঙ্গে ব্যক্তিসত্তাবিষয়ক ধারণার নিবিড় সম্বন্ধ আছে। বর্তমান প্রবন্ধে বাংলা অঞ্চলের দর্শনধারাগুলোতে দেশ-কাল ও ব্যক্তিসত্তা সম্পর্কিত ভাবনার অনুসন্ধান করা হয়েছে। এতে দেখা যায়, যোগাচারবাদী বৌদ্ধদের দেশ-কালের ধারণা চেতনানির্ভর। বৌদ্ধ সহজিয়াদের উপর যোগাচারবাদ ও মাধ্যমিক– এই উভয় ধারার প্রভাব লক্ষ করা যায়। এ কারণে লুইপার চর্যায় আমরা চেতনানির্ভর কালের ধারণা পাই, অন্যদিকে কাহ্নপার ব্যক্তি সম্পর্কিত ধারণা মাধ্যমিকদের অনুরূপ। মাধ্যমিকবাদী দার্শনিক শান্তরক্ষিত কালকে দেখেছেন কার্য-কারণের নিরন্তর প্রবাহ হিসেবে। ব্যক্তিসত্তাও সেই প্রবাহের অংশ। নব্য নৈয়ায়িকেরা দেশ-কালকে ব্যাখ্যা করেন সম্বন্ধের ভিত্তিতে। এতে ব্যক্তিসহ সমস্ত নশ্বর প্রপঞ্চই খণ্ডকালের সঙ্গে সম্বন্ধের ভেতর দিয়ে অস্তিত্বশীল হয়। বাউল দার্শনিকদের কালচেতনা দেহ বা দেশকেন্দ্রীক। কাজেই তাদের কাছে ব্যক্তির দেহের বর্তমানই একমাত্র কাল।]

আমরা দৈনন্দিন আলাপচারিতায় স্থান ও কালবাচক নানা ধারণা প্রকাশ করি। কাছে-দূরে, উপরে-নিচে, ডানে-বামে, সামনে-পেছনে ইত্যাদি পদ ব্যবহার করে আমরা স্থানবাচক অবধারণ প্রকাশ করি। আবার যখন বলি, 'রহিম করিমের চেয়ে ছোট', 'হাতে সময় নেই', 'এখন মহামারির কাল চলছে', কিংবা 'ক্লাসে যাবার সময় হলো'– এসব বাক্য কালবাচক ধারণা প্রকাশ করে। দৈনন্দিন বাক্যালাপে খুব স্বচ্ছন্দে কালবাচক ধারণা প্রকাশ করা গেলেও যখন কেউ জিজ্ঞেস করে, কাল কী? আমরা এ প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়ে হিমশিম খাই। এ কারণে দার্শনিক সেন্ট অগাস্টিন বলেছিলেন, 'কেউ যদি জিজ্ঞেস না করে, সময় কী? সেক্ষেত্রে সময় কী, তা আমি জানি, কিন্তু কারো জিজ্ঞাসার জবাবে আমি যদি সময়কে ব্যাখ্যা করতে যাই, তাহলে

* **মো. জহির রায়হান :** প্রফেসর, দর্শন বিভাগ, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্বাবদ্যালয়।

আমি জানি না।' (*কনফেশনস*: ১১: ১৪) অর্থাৎ কালচেতনা আমাদের জীবন যাপনের অংশ হলেও স্পষ্ট ভাষায় কালকে ব্যাখ্যা করা দুরূহ ব্যাপার।

কালচেতনা এক রকমের নয়। সময় বলতে প্রায়শ ঘড়ির সময়কেই বুঝানো হয়ে থাকে। সময়ের এ ধরনটি গতির ধারণার সঙ্গে যুক্ত। দু'ধরনের গতিশীল বস্তুর মধ্যে তুলনার মাধ্যমে ঘড়ির সময় নির্ধারিত হয়ে থাকে। এই দু'ধরনের গতির একটি হলো, নিজ অক্ষে পৃথিবীর ঘুর্ণন বা আহ্নিক গতি, অন্যটি ঘড়ির কাঁটার ঘূর্ণন। নিজ অক্ষে পৃথিবীর ঘূর্ণনকে মানদণ্ড ধরে ঘড়ির কাঁটার ঘূর্ণনের তুলনা করা হয়। এতে পৃথিবী যখন ১৫ ডিগ্রি ঘোরে, তখন ঘড়ির ঘন্টার কাঁটা ঘোরে ৩০ ডিগ্রি। অর্থাৎ পৃথিবী নিজ অক্ষে ৩৬০ ডিগ্রি ঘুরে উঠলে ঘন্টার কাঁটা ডায়ালের বৃত্তে দু'বার পাক খায়। এ থেকে আমরা ২৪ ঘন্টার সময় হিসাব করি। কাজেই ঘড়ির সময় আদতে নিরন্তর ঘূর্ণমান পৃথিবীর গতিরই পরিমাপ। কিন্তু এছাড়াও নানা রকম কালচেতনা আছে– যখন আমরা বলি, 'বয়স বাড়ছে' কিংবা 'এটি একুশ শতকের চ্যালেঞ্জ' অথবা 'যুগান্তর ঘটছে'– কালবাচক এসব অভিব্যক্তিতে সময়ের ধারণা ভিন্ন ভিন্ন রকম। এমনই নানা রকম কালচেতনা আচ্ছন্ন করে থাকে ব্যক্তি-অস্তিত্বকে, যার প্রকাশ ঘটে আমাদের জীবনবোধ, শিল্পসৃষ্টি, সমাজ বিশ্লেষণ ও যুক্তি-জিজ্ঞাসার ভেতর।

আমরা স্থান বলতে বস্তুর বিস্তারকে বুঝি। এক্ষেত্রে এমন প্রশ্ন ওঠে, মহাবিশ্বে কোনো বস্তু যদি না থাকে তবে কি স্থানের অস্তিত্ব থাকবে? এমন নির্বস্তুক স্থানের ধারণাকেই বলে পরম স্থান। কালের ক্ষেত্রেও একই প্রশ্ন ওঠে যে, বস্তু বা স্থান নিরপেক্ষ কালের অস্তিত্ব কি সম্ভব? পরম সময় বলতে এরকম ধারণাকে নির্দেশ করা হয়। অন্যদিকে, এসবের বিপরীতে আছে আপেক্ষিক দেশ-কালের ধারণা। আপেক্ষিক কাল বস্তুনিরপেক্ষ নয়, বরং বস্তুর ভেতরকার গতি ও পরিবর্তনই কাল। আপেক্ষিক কালের ধারণায় স্থান, বস্তু ও গতিকে পরস্পর থেকে আলাদা করা যায় না। দেশনির্ভর কালের ধারণা অনুসারে, বস্তুর নিরন্তর পরিবর্তনই কাল।

কাল কি একরৈখিক নাকি চক্রাবর্তমূলক? প্রাচীন গ্রীসের শিল্প-সাহিত্যে যে কালের ধারণা পাওয়া যায় তা একরৈখিক। যদিও হোমারীয় কালচেতনার সঙ্গে ট্র্যাজেডি নাট্যের কালচেতনা অভিন্ন নয়। কিন্তু উভয়েই প্রধানত একরৈখিক। একই কালচেতনার বিবর্তিত রূপ ধরা পড়ে ইউরোপীয় শিল্পবিপ্লব পরবর্তী সমাজে। পশ্চিমের বুদ্ধিজীবীরা কালের ধারণার সঙ্গে প্রগতির ধারণা যুক্ত করে সমাজ ও সভ্যতার অগ্রগতি ব্যাখ্যা করেন। মার্কসীয় সমাজ পরিবর্তনের ধারণাতেও এই একরৈখিক কালচেতনার প্রকাশ লক্ষ করা যায়। উপনিবেশ পরবর্তী ইন্দো-বাংলার বুদ্ধিজীবীতা এই একরৈখিক কালের ধারণা দিয়েই আচ্ছন্ন (নীহাররঞ্জন রায় ১৯৯২: ২০-২১)। আমাদের আধুনিক বুদ্ধিজীবীরা ঔপনিবেশিকদের কালের ধারণাকেই গ্রহণ করেছেন। ইউরোপীয় উপনিবেশ একরৈখিক কালচেতনাকে সর্বজনীন করে তুলেছে এবং ঔপনিবেশিকেরা

বলার চেষ্টা করেছেন, চক্রাবর্তমূলক সময়ের ধারণা দিয়ে প্রগতি ও বিপ্লবকে ব্যাখ্যা করা যায় না। কাজেই তাঁদের মতে, ইন্দো-বাংলার এমন কালচেতনা প্রগতি ও বিপ্লব পন্থার অন্তরায়। যদিও উপনিবেশিত বুদ্ধিজীবীরা যথাযথভাবে অনুসন্ধান করে দেখেননি যে, এদেশের উপনিবেশপূর্ব জনগোষ্ঠীগুলোর কালচেতনা প্রকৃতপক্ষে কেমন এবং সব ক্ষেত্রে তা একই রকম কিনা।

উপনিবেশপূর্ব বাংলার বিভিন্ন জনগোষ্ঠী ও সম্প্রদায়ের মধ্যে কালচেতনা এক রকমের নয়। তাদের জীবনবোধ, দর্শন এবং শিল্প-সাহিত্যে নানা রকমের কালচেতনার প্রকাশ দেখা যায়। চক্রাবর্তমূলক কালচেতনার প্রকাশও আমরা দেখি ধর্ম, দর্শন, চিত্রকলা, ভাস্কর্য, নাটক, কাব্য ইত্যাদিতে। এ ধরনের কালচেতনায় বর্তমানটাই মূখ্য হয়ে থাকে, যেন এক চিরবর্তমানকাল সত্তা ও অস্তিত্বসমূহের এক বিশেষ অবস্থাকে মূর্ত করে তুলছে। বৌদ্ধ দর্শনের নানা ধারায় রয়েছে ভিন্ন ভিন্ন কালচেতনা, যেমন মাধ্যমিক বৌদ্ধ দর্শনে কালকে দেখা হয় বিরামহীন প্রবাহ হিসেবে, যেখানে সবকিছুই অনিত্য এবং কাল যেখানে কার্য ও কারণের পরম্পরা থেকে সৃষ্ট। এই কালচেতনা অনুযায়ী সমস্ত কিছুই প্রতীত্যসমুৎপন্ন, অর্থাৎ বিশেষ বিশেষ কারণিক শর্ত দ্বারা সৃষ্ট। কিন্তু বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের বৈভাষিক ধারা কালকে দেখে উৎপত্তি, স্থিতি ও বিনাশের প্রক্রিয়া হিসেবে। অন্যদিকে যোগাচারবাদীদের কাছে সময় হলো চেতন প্রবাহ। এই কাল ব্যক্তিচেতনা নির্ভর। অন্যদিকে, নব্য-নৈয়ায়িকেরা কালকে দেখেছেন ক্রিয়া বা গতির উপাধি (imposed property) হিসেবে। যদিও নব্য নৈয়ায়িক রঘুনাথ শিরোমণি কাল সম্পর্কে একেবারেই ভিন্ন মত দেন। তিনি কালকে দেখেন সরল পদার্থরূপে। বাউল সম্প্রদায়ের মধ্যেও আছে ভিন্নতর কালচেতনা। তাদের কাছে দেহ বা দেশই মূখ্য, একারণে তারা বিশ্বাস করেন, বর্তমানই একমাত্র কাল।

দেহাত্মবাদী ধারণা অনুসারে, ব্যক্তিসত্তা দেহনির্ভর। এক্ষেত্রে দেহ পরিবর্তনশীল হলে ঐক্যধর্মী ব্যক্তি বলে কিছু থাকবে না। সেক্ষেত্রে প্রশ্ন ওঠে, ব্যক্তির কর্মকে কী করে ব্যাখ্যা করা যাবে? ব্যক্তির কর্তাসত্তা কি নিছক একটি ধারণামাত্র? যদি ব্যক্তি নিজেই কালচেতনার আধার হয়, তবে ইতিহাসের গতি-প্রকৃতির ব্যাখ্যা কী হবে? এসব প্রশ্নের ফয়সালা বাংলার জনদর্শনে কীভাবে করা হয়েছে, তার জবাব অনুসন্ধানই বর্তমান প্রবন্ধের লক্ষ্য।

২

বৌদ্ধ মহাযান মতের যোগাচারবাদী ধারা বাহ্যবস্তুর স্বতন্ত্র অস্তিত্ব স্বীকার করে না। তাদের মতে, কেবল চেতনাই সত্য। যোগাচারবাদী দার্শনিক বসুবন্ধু তাঁর *বিজ্ঞপ্তিমাত্রতাসিদ্ধি* বইয়ের শুরুতে নিজের অবস্থান স্পষ্ট করেন এভাবে: ‘সবই ধারণামাত্র। কারণ অস্তিত্ব নেই এমন বস্তুই আমাদের কাছে বাহ্যবস্তু আকারে হাজির হয়’ (বসুবন্ধু ১৯৮০: ৩)।

এ অবস্থানের বিরুদ্ধে প্রধান অভিযোগটিকে বসুবন্ধু উপস্থাপন করেন এভাবে: 'যদি দৃশ্যমান বাস্তবতার উদ্ভবের পেছনে স্বতন্ত্র বস্তুর অস্তিত্ব না থাকে, তাহলে নির্দিষ্ট দেশ ও কালে তাদেরকে আমরা দৃশ্যমান দেখি কেন, কিংবা একেকজনের মন একেক স্থানে দেখে না কেন? কিংবা বস্তুর কারণিক তাৎপর্য সৃষ্টি হয় কীভাবে?' (বসুবন্ধু ১৯৮০: ৩) এ অভিযোগের জবাবে বসুবন্ধু ব্যক্তির স্বপ্ন দেখার দৃষ্টান্ত দেন, যাতে বাহ্যবস্তুর অস্তিত্ব না থাকলেও দেশ-কালের ঐক্য রক্ষিত হয় এবং দেহের উপর স্বপ্নের কারণিক প্রভাবও পড়ে।

বাহ্যবস্তুর অস্তিত্বের বিপক্ষে যোগাচারবাদীদের আরেকটি যুক্তি হলো: চেতনার পক্ষে কেবল চেতনার সমধর্মী সত্তাকেই জানা সম্ভব। অর্থাৎ চেতনা যাকে জানে তা চেতনার স্বভাববিশিষ্ট্য। যদি চেতনস্বভাব থেকে চেতনার বস্তু পৃথক হতো, তাহলে চেতনার পক্ষে সেই বস্তুকে জানার বৈধতা নিশ্চিত করা যেত না।

যোগাচারবাদীদের মতে বাহ্যবস্তুর স্বতন্ত্র অস্তিত্ব নেই, কাজেই তাদের চিন্তায় বস্তুগত কালের ধারণাও থাকতে পারে না। তারা কাল বলতে যা বুঝেছেন, তা চেতনানির্ভর। তারা বলেন, চেতনার একটি ভাগে আছে আলয়বিজ্ঞান, যাকে আশ্রয় করে থাকে যাবতীয় জ্ঞান এবং আমরা স্থান-কাল রূপে যে ধারণা পাই, তা আসে সেই আলয়বিজ্ঞান থেকে।

যোগাচার মতে, উদ্ভবমাত্রই কোনো সত্তার বিলয় ঘটে। এটা যেকোনো সত্তার সহজাত বৈশিষ্ট্য এবং এগুলোই একেকটি ক্ষণ। অস্তিত্ব এরকম ক্ষণগুলোর প্রবাহ। কাজেই প্রতীত্যসমুৎপাদকে যোগাচারবাদীরা দেখেন কালিক পরম্পরা হিসেবে। এখানে খেয়াল রাখা জরুরি যে, বুদ্ধকথিত প্রতীত্যসমুৎপাদ তত্ত্বটিকে যোগাচারবাদীরা কেবল চেতনার ক্ষেত্রে প্রয়োগযোগ্য মনে করেন, কারণ তাদের মতে বাহ্যবস্তুর কোনো অস্তিত্ব নেই।

বসুমিত্র বিশ্বাস করতেন, পরিবর্তন মানে অবস্থার ভিন্নতা, দ্রব্যের ভিন্নতা নয়। ভিন্ন ভিন্ন কারণিক প্রভাবে এই অবস্থান্তর ঘটে। বসুমিত্রের এই মতটিকে বসুবন্ধু মেনে নেন এবং তিনি বিশ্বাস করেন, কালের তিনটি পর্যায়– অতীত, বর্তমান এবং ভবিষ্যৎ নির্ধারিত হয় কারণিক সক্রিয়তা থেকে (বসুবন্ধু ১৯৮০: ১৪১)। কাজেই বিভিন্ন ক্ষণের মধ্যে যে কারণিক সংযোগ, সেটাই ব্যাপ্তিকাল (duration)।

বৌদ্ধ সহজিয়াদের চিন্তায় যোগাচার ধারার প্রভাব আছে, যেমন লুইপা রচিত চর্যাগীতিতে কালকে সম্পর্কিত করা হয়েছে চেতনার সঙ্গে। তবে এ ধারণায় দেহ গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে। তিনি বলেন:

> দেহ হলো সুন্দর গাছ যার পাঁচখানা ডাল।
> চঞ্চল চিত্তে কাল প্রবিষ্ট হলো॥
> দৃঢ় করে মহাসুখ পরিমাপ করো।
> লুই বলেন, গুরুকে জিজ্ঞেস করে জেনে নাও॥ (চর্যা: ১)

অর্থাৎ দেহ হচ্ছে এমন এক বৃক্ষ যার আছে পাঁচখানা ডাল, মানে পঞ্চ ইন্দ্রিয়। এই ইন্দ্রিয়ের আলোড়নে চিত্ত চঞ্চল হয় এবং তাতে কাল প্রবেশ করে। কাজেই ইন্দ্রিয়ের তৎপরতার কারণে চেতনায় ধারণার যে পরম্পরা সৃষ্টি হয় সেটাই কাল। লুইপা এ কারণে কালের গতিকে এড়াতে গুরুর সাহায্য নিয়ে যোগের মাধ্যমে ইন্দ্রিয় নিয়ন্ত্রণের কথা বলেন।

বৌদ্ধ সহজিয়ারা ব্যক্তিবোধের উদ্ভবের জন্য ইন্দ্রিয়জাত ভেদজ্ঞান ও অবিদ্যাকে দায়ী করেন। ইন্দ্রিয়জাত ধারণা অখণ্ড সত্তা থেকে 'আমি'কে আলাদা হিসেবে চিহ্নিত করে, ফলে আত্ম-পর ভেদ সৃষ্টি হয়। তাঁদের মতে, স্কন্ধবিয়োগের ফলে যখন 'আমি' ধারণার বিলোপ ঘটে, তখন ব্যক্তিসত্তা পুনরায় ত্রিলোকে ব্যাপ্ত হয়ে যায়। কাহ্নপা একে সাগর ও সাগরের ঢেউয়ের সঙ্গে তুলনা করেন। ঢেউ ভেঙে গেলে সমুদ্রের অস্তিত্ব নিঃশেষিত হয় না। কাহ্নপা বলেন:

> চিত্ত স্বতস্ফূর্তভাবে শূন্য দ্বারা সম্পূর্ণ।
> স্কন্ধবিয়োগে কাতর হয়ো না॥
> কী করে বলছ, কাহ্ন নেই!
> তিনি বিরাজিত অনুদিন ত্রিলোক ব্যাপ্ত করে॥
> যা দৃশ্যমান তার ধ্বংস দেখে মূঢ়রা কাতর হয়।
> তরঙ্গভঙ্গ কি সাগরকে শোষণ করতে পারে॥ (চর্যা: ৪২)

অর্থাৎ ব্যক্তিবোধের জন্ম হয় সাগর থেকে ঢেউকে আলাদা করার মতো শূন্যস্বরূপ থেকে 'আত্ম'কে আলাদা ভাবার কারণে। কিন্তু স্কন্ধবিয়োগে এই ব্যক্তি শূন্যতাসমুদ্রের অংশ হয়ে যায়।

যোগাচারবাদী দার্শনিকেরা 'আমি' ধারণার উদ্ভবের কারণ হিসেবে বস্তুর পরতন্ত্র স্বভাবকে দায়ী করেন। বস্তুর পরতন্ত্র স্বভাব হলো, অন্য বস্তুর ওপর তার নির্ভরতা। এই আপেক্ষিকতাই 'জ্ঞাতা-জ্ঞেয়', 'আমি-তুমি' ইত্যাদি দ্বৈতভাবের জন্ম দেয় (দিলীপকুমার মোহান্ত ২০১৭: ৯১-৯২)। কাজেই ব্যক্তিসত্তার উপলব্ধিও একটি আপেক্ষিক ধারণা। যোগাচারী দার্শনিক বসুবন্ধু তাঁর 'ত্রিস্বভাবনির্দেশ' রচনায় বলেন, সংক্লেশ ও বাসনার বীজস্বরূপ চিত্তই দ্বৈততার বোধের জন্য দায়ী। প্রকৃতপক্ষে এই দ্বৈততার কোনো অস্তিত্ব নেই (মোহান্ত: ৯২)। সুতরাং যোগাচারবাদ অনুসারে 'আমিত্ব' একটি নির্মিত ধারণা।

৩.

বৌদ্ধ দর্শনে মাধ্যমিক ধারা প্রবর্তন করেন আচার্য নাগার্জুন। চূড়ান্ত সত্তা সম্পর্কে তিনি কোনো দার্শনিক অবস্থান নেন না, বরং এ বিষয়ে যেকোনো একপেশে অবস্থানকে যুক্তির মাধ্যমে খারিজ করে দেন। নাগার্জুন তাঁর *মূলমধ্যমককারিকা* বইয়ে

চতুষ্কোটিপ্রতিষেধ পদ্ধতি প্রয়োগ করে সময়ের অস্তিত্বকেও অস্বীকার করেন। তিনি বলেন:

> যদি বর্তমান ও ভবিষ্যৎ
> অতীতনির্ভর হয়,
> তাহলে বর্তমান ও ভবিষ্যৎ
> অস্তিত্বশীল ছিল অতীতে। (*মূলমধ্যমককারিকা*: ১৯.১)

আমরা সময়ের তিনটি ধরন অনুমান করে থাকি। এই ধরনগুলোর উপর ভিত্তি করে পূর্বতঃসিদ্ধ অনুমানের সাহায্যে অতীত থেকে বর্তমানে আসা যায়, আবার পরতঃসিদ্ধ অনুমানের সাহায্যে বর্তমান থেকে অতীতে যাওয়া যায়। এছাড়া সাধারণ পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে আমরা বর্তমান থেকে বর্তমানকে অনুমান করতে পারি। এ ধরনের অনুমানের সঙ্কট সম্পর্কে নাগার্জুন বলেন, যদি বর্তমান ও ভবিষ্যৎকে আমরা অতীত থেকে বুঝি, তবে বলতেই হবে, সময় অস্তিত্বশীল ছিল অতীতে। কারণ বর্তমান ও ভবিষ্যৎকে প্রমাণ করা যাচ্ছে না।

কালের অনস্তিত্ব বিষয়ে নাগার্জুনের দ্বিতীয় যুক্তিটি হলো, যেহেতু এমন কোনো সময় নেই যা থেমে আছে। কাজেই সময়কে যদি প্রত্যক্ষই করা না যায় তবে বর্তমান আছে, এটা বলা যায় না (*মূলমধ্যমককারিকা*: ১৯.১)। এই যুক্তিটিকে একটা দৃষ্টান্ত দিয়ে দেখানো যায়: কোনো গাছ থেকে যখন একটি ফল নিচে পড়ে, আমরা কেবল দেখি, ফলটি কত সময় ধরে পড়েছে এবং কত সময় ধরে পড়বে, বর্তমান মুহূর্তটিকে আমরা প্রত্যক্ষণে পাই না। আবার, যদি 'বর্তমান' না থাকে, তবে অতীত বা ভবিষ্যৎও থাকবে না। যেহেতু তারা পরস্পর সম্পর্কিত।

কালের অনস্তিত্ব বিষয়ে নাগার্জুনের তৃতীয় যুক্তিটি এরকম:

> কাল যদি কোনো সত্তার উপর নির্ভরশীল হয়
> তবে ওই সত্তা ছাড়া তা কী করে অস্তিত্বশীল থাকতে পারে?
> কোনো সত্তার চূড়ান্ত অস্তিত্ব প্রমাণ করা যায় না।
> কাজেই সময়ের অস্তিত্ব থাকে কী করে? (*মূলমধ্যমককারিকা*: ১৯.৬)

নাগার্জুন এ যুক্তিতে বস্তুনির্ভর কালের ধারণা খণ্ডন করেন। আমরা বস্তুগত কালের ধারণা পাই বস্তুর গতি ও পরিবর্তন থেকে। কিন্তু নাগার্জুন বস্তুর চূড়ান্ত অস্তিত্বের প্রামাণিকতা স্বীকার করেন না। কাজেই বস্তু না থাকলে বস্তুনির্ভর কালও থাকতে পারে না। নাগার্জুন কাল বলতে যা স্বীকার করেন, সেটি অভিজ্ঞতালব্ধ প্রপঞ্চের ভেতরকার সম্বন্ধ। ওইসব প্রপঞ্চ এবং তাদের সম্পর্ক ছাড়া সময়ের কোনো অস্তিত্ব নেই (নাগার্জুন ১৯৯৫: ২৫৭)। এই যুক্তির মাধ্যমে নাগার্জুন কালের স্বনির্ভর অস্তিত্বকে অস্বীকার করলেও আপেক্ষিক কালের ধারণাকে তিনি স্বীকার করেন।

কাল সম্পর্কিত নাগার্জুনের অবস্থান থেকে প্রাচীন নৈয়ায়িক গৌতমের অবস্থান আলাদা। তাঁর *ন্যায়-সূত্রে* নাগার্জুনের যুক্তির কয়েকটি বিরুদ্ধ যুক্তি দেখতে পাওয়া যায়। গৌতম বলেন: এভাবে অতীত বা ভবিষ্যৎ প্রতিষ্ঠিত হয় না, যেহেতু এর ভিত্তি পারস্পরিকতা (*ন্যায়-সূত্র*: ২.১.৪১)। অর্থাৎ যদি বলা হয়, অতীত হলো যা ভবিষ্যৎ নয়, এবং ভবিষ্যৎ হলো যা অতীত নয়– এ ধরনের সংজ্ঞায় পারস্পরিক নির্ভরতার অনুপপত্তি ঘটে। গৌতমের দাবি, আমাদেরকে বর্তমান কালের সঙ্গেই অতীত ও ভবিষ্যৎকে সম্পর্কিত করতে হবে।

গৌতম দ্বিতীয় যুক্তিটি দেন জ্ঞানতাত্ত্বিক দিক থেকে। নৈয়ায়িকেরা যেহেতু প্রত্যক্ষণকে জ্ঞানের প্রমাণ হিসেবে স্বীকার করে, কাজেই তাঁর যুক্তি হলো:

> যদি বর্তমান কাল না থাকে,
> তাহলে, ইন্দ্রিয় প্রত্যক্ষণ অসম্ভব হবে,
> জ্ঞানও অসম্ভব হবে। (*ন্যায়-সূত্র*: ২.১.৪২)

অর্থাৎ আমরা এটা দাবি করি না যে, জ্ঞান বলতে কিছু নেই। যদি জ্ঞানের সম্ভাব্যতাকে স্বীকার করা হয়, তবে প্রত্যক্ষণকেও স্বীকার করতে হবে। আর প্রত্যক্ষণমাত্রই বর্তমানে ঘটে। কাজেই বর্তমান না থাকলে প্রত্যক্ষণলব্ধ জ্ঞানকেও অস্বীকার করতে হবে। এভাবে ব্যতীরেকী প্রমাণের মাধ্যমে গৌতম কালের ধারণা প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করেন।

গৌতম আরেকটি ব্যবহারিক যুক্তি দেন। তিনি বলেন, কোনো বস্তু সৃষ্টি হয়েছে এবং কোনোটি সৃষ্টি হবে, বাস্তবিকভাবে আমরা এমন ধারণা করতে পারি এবং এ থেকে অতীত ও ভবিষ্যৎ সম্পর্কে ধারণা পাওয়া যায়।

এটা স্পষ্ট যে, গৌতম বর্তমান কাল থেকে অতীত কিংবা ভবিষ্যতকে অনুমান করতে চান এবং তাঁর মতে, বর্তমানের অস্তিত্ব না থাকলে 'প্রত্যক্ষণ' কিংবা 'জ্ঞান' অসম্ভব হতো। যেহেতু আমরা প্রত্যক্ষণ কিংবা জ্ঞানের অস্তিত্বকে অস্বীকার করছি না, কাজেই বর্তমানের অস্তিত্বকেও স্বীকার করতে হবে। নাগার্জুন অবশ্য তাঁর দ্বিতীয় যুক্তিতে বর্তমানের অস্তিত্ব খণ্ডন করেন। তাঁর মতে, বর্তমানকে আমরা প্রত্যক্ষণে পাই না। আমরা যখন একটা পতনশীল বস্তুর অভিজ্ঞতা লাভ করি, তাতে বর্তমান বলে কোনো কাল থাকে না। অভিজ্ঞতালব্ধ প্রপঞ্চের মধ্যে সম্বন্ধ সৃষ্টি করে আমরা একটা আপেক্ষিক কালের ধারণায় পৌঁছাই। এটাই কাল সম্পর্কে নাগার্জুনের ধারণা।

৪.

বৌদ্ধ দর্শনের প্রতীত্যসমুৎপাদ তত্ত্ব এবং অনিত্যতার তত্ত্ব থেকে কালের ধারণা পাওয়া যায়। নাগার্জুন প্রবর্তিত মাধ্যমিক ধারার দার্শনিকেরা এসব তত্ত্ব বিশ্লেষণ করে সিদ্ধান্ত নেন যে, বস্তুর কোনো সহজাত অস্তিত্ব নেই, আছে কেবল ব্যবহারিক (provisional)

অস্তিত্ব। এ থেকে বিরুদ্ধবাদীরা এমন প্রশ্ন উত্থাপন করেন যে, বস্তুর যদি সহজাত অস্তিত্বই না থাকে তবে তা কী করে কারণ হিসেবে কোনো কার্য উৎপাদন করতে পারে? এ প্রশ্নের জবাবে মাধ্যমিকরা বলেন, বস্তুর যদি সহজাত প্রকৃতি থাকত তবে তা স্বনির্ভর হতো এবং অন্য কোনো বস্তু বা সত্তার সঙ্গে তার কোনো সম্পর্ক থাকার প্রয়োজন থাকত না (ভিক্টর ম্যানসফিল্ড ১৯৯৮)। এই পরস্পরনির্ভর হয়ে চলা, প্রতিনিয়ত সম্পর্কের বদল এবং পরিবর্তনের ধর্মই কালের ধারণার গোড়ায় কাজ করে। বস্তুর যদি সহজাত অস্তিত্ব থাকত তবে তা হতো চিরায়ত কারণ এবং জগৎ হয়ে উঠত চিরবর্তমান।

যে অনিত্যতার তত্ত্ব বৌদ্ধ কালের ধারণা সৃষ্টি করেছে, সে সম্পর্কে প্রতিপক্ষীয়রা আপত্তি জানান। শান্তরক্ষিত প্রতিপক্ষ সমালোচকদের অভিযোগটি উত্থাপন করেন এভাবে: 'ক্ষণস্থায়িত্বের আদলে, জগতের সবকিছুই যদি অনিত্য হয়, তাহলে কারণ ও তার ফলাফলের মধ্যে কোনো সম্পর্ক কী করে থাকতে পারে? কিংবা কর্ম ও কর্মফল.. ইত্যাদির মধ্যে?' (*তত্ত্বসংগ্রহ*: ৪৯৭)

তাদের যুক্তি এই যে, সবকিছুই যদি ক্ষণস্থায়ী হয় তবে তা কার্য উৎপাদন কীভাবে করবে? শান্তরক্ষিত সমালোচকদের অভিযোগের জবাব দিতে গিয়ে কার্য-কারণ সম্পর্কের ভিত্তিতে অনিত্যতা ব্যাখ্যা করেন। তিনি বলেন, এখানে দুটি বিকল্প আছে: প্রথমত: কার্য উৎপাদিত হচ্ছে কারণ থেকে, যা নিজেই বিনাশপ্রাপ্ত হয়েছে এবং দ্বিতীয়ত: কার্য উৎপাদিত হয়েছে যে কারণ থেকে তার বিনাশ ঘটেনি। যেহেতু ধ্বংসপ্রাপ্ত হওয়া ও না হওয়ার মাঝামাঝি কিছু থাকতে পারে না। প্রথম বিকল্পটি ঠিক নয়, কারণ যা ধ্বংস হয়ে গেছে, তা অনস্তিত্বশীল এবং অনস্তিত্বশীল কিছু থেকে যদি কার্য উৎপাদিত হয়, তবে বলতে হবে, কারণ ছাড়াই কার্য উৎপাদিত হয়েছে। এবং কারণ ছাড়া কার্য উৎপাদিত হওয়া মানে, সেটি হবে চিরকালীনভাবে অস্তিত্বশীল। দ্বিতীয় বিকল্পটিও ঠিক নয়, কারণ সেক্ষেত্রে বস্তুগুলো কিছুকাল স্থিতিশীল হবে, যা ক্ষণস্থায়ীত্বের ধারণার সঙ্গে সাংঘর্ষিক। এখানে কিছুকাল স্থিতিশীল হওয়া মানে, ধরা যাক চার মুহূর্ত স্থায়ী হওয়া– প্রথমত: বস্তুটির অস্তিত্বশীল হওয়ার মুহূর্ত, দ্বিতীয়ত: তার ক্রিয়া করার মুহূর্ত, তৃতীয়ত: কার্য উৎপন্ন হওয়ার মুহূর্ত এবং চতুর্থত: বস্তুটির বিনাশের মুহূর্ত। চারটি মুহূর্তের এই স্থিতিশীলতাও বস্তুর ক্ষণস্থায়ী হওয়ার ধারণাকে খারিজ করে। সেকারণে শান্তরক্ষিত অনিত্যতার ব্যাখ্যাটি দেন এভাবে:

> আমাদের ব্যাখ্যাটি এরকম: কার্য উৎপাদিত হয় দ্বিতীয় মুহূর্তে, 'কারণ' অস্তিত্বশীল হয়েছিল প্রথম মুহূর্তে, এবং ওই সময়ে তা ধ্বংস হয়ে যায়নি। তবে ক্ষণস্থায়ী হওয়ার কারণে যখনই কার্য উৎপাদিত হয়, সেই মুহূর্তে কারণের অস্তিত্ব থাকে না; যদিওবা তা থাকত সেটা হতো অকার্যকর, কেননা ইতোমধ্যে কার্য উৎপাদিত হয়ে গেছে। যা ইতোমধ্যে

> অস্তিত্বশীল হয়েছে, তা দ্বারা সেটা আবারও উৎপাদিত হবে না; কেননা অস্তিত্বশীল হওয়া মানে এমন কিছুর আবির্ভাব ঘটা যা আগে ছিল না। যদি তা না হতো, তবে ব্যাপারটি হতো অনিঃশেষ। অতএব আমরা উপসংহার টানছি এই বলে যে, কার্য অস্তিত্বশীল হয় দ্বিতীয় মুহূর্তে, এবং এই কার্যটি উৎপন্ন হয় কোনো নিমিত্ত কারণ থেকে যা প্রথম মুহূর্তে অস্তিত্বশীল ছিল, তখনও এই কারণের বিনাশ ঘটেনি। যদি ধরে নেয়া হতো যে, কার্য অস্তিত্বশীল হয় তৃতীয় মুহূর্তে, তখন বলা যেত যে, কার্য উৎপাদিত হয়েছে বিনাশ হয়ে যাওয়া কারণ থেকে, যেখানে উন্নীত হওয়ার কারণের অবসান হেতু একই ব্যাপার ঘটতো কার্যের ক্ষেত্রেও। কার্য ও কারণের সহ-অস্তিত্বশীলতার বিষয়টি ঘটতো যদি কার্যটি প্রথম মুহূর্তে অস্তিত্বশীল হতো। (*তত্ত্বসংগ্রহ*: ৫০৯-৫১৪)

বৌদ্ধদের অনিত্যতাবাদ বা বস্তুর বিরামহীন প্রবাহের ধারণার বিরুদ্ধে আরও কিছু অভিযোগ ওঠে, যেমন বিরামহীন প্রবাহ যদি সত্যি হয়, তবে যে মুহূর্তে কোনো ব্যক্তি 'কর্ম' করবে আর যখন কর্মফল ভোগের সময় আসবে, তখন সে একই ব্যক্তি থাকবে না। কুমারিল ভট্টের অনুসারীদের আপত্তি এই যে, বুদ্ধিমান ব্যক্তি আগে থেকেই জানবে যে, কর্মফল ভোগের জন্য সে অস্তিত্বশীল থাকবে না, কাজেই সে তার কর্ম থেকে বিরত থাকবে। কাজেই বিরামহীন প্রবাহ সত্যি হলে কর্মেরই অস্তিত্ব থাকবে না (শান্তরক্ষিত ১৯৩৭: ২৮৭)। 'বিরামহীন প্রবাহ' ধারণার বিরুদ্ধে আরেকটি আপত্তি আসে প্রত্যক্ষণের দিক থেকে। বস্তুগুলো যদি ক্ষণস্থায়ী হয়, তবে প্রত্যক্ষণের সময় তারা অস্তিত্বশীল থাকবে না। কাজেই তাদের প্রত্যক্ষণও সম্ভব হবে না। বস্তুটির অস্তিত্বশীলতা যদি কারণ হয়, তবে প্রত্যক্ষিত হবার মূহূর্তটি তার ফলাফল, কিন্তু এই ফলাফল উৎপাদনের মুহূর্তটিতে তার অস্তিত্ব থাকবে না। কাজেই প্রত্যক্ষণও সম্ভব হবে না। আরও অভিযোগ, যদি 'বিরামহীন প্রবাহ' সত্যি হয়, তবে 'পরিচয়' ব্যাপারটি অসম্ভব হবে। কেননা দেবদত্ত যা দেখেছে, বিষ্ণুমিত্র তা দেখে একই বস্তু বলে চিনবে না। একইভাবে সমস্ত বস্তু যদি বিরামহীন প্রবাহের অধীন হয়, তবে 'স্মৃতিচারণ'-এর মতো ঘটনাও অসম্ভব হবে। যেহেতু একক ব্যক্তির অস্তিত্ব থাকবে না। বস্তুর 'বিরমাহীন প্রবাহ' সত্য হলে, ভব-বন্ধন ও বন্ধনমুক্তিও সম্ভব নয়, কারণ বন্ধন যে মুহূর্তে ঘটে, তা থেকে মুক্তির মুহূর্ত আলাদা (শান্তরক্ষিত: ২৯২-৯৩)। কাজেই যে ব্যক্তি ভববন্ধনে আবদ্ধ ছিল আর যে ব্যক্তি বন্ধন মুক্ত হলো তারা একই ব্যক্তি নয়।

শান্তরক্ষিত তাঁর *তত্ত্বসংগ্রহ* বইয়ে এসব অভিযোগের জবাব দেন। তিনি ব্যক্তির বন্ধন-মুক্তি সম্পর্কিত অভিযোগ খণ্ডনে ব্যবহারিক সত্যের উপর ভিত্তি করে বলেন, 'বন্ধনমুক্ত ব্যক্তিকে সর্বদা দেখা যায় এমন একজন হিসেবে, যে ব্যক্তি ভব-বন্ধনে

আবদ্ধ ছিল, ইত্যাদি; কাজেই এমন বিবৃতি "বন্ধন-মুক্ত ব্যক্তির মুক্তি ঘটেছে"– এমন বিবৃতি সর্বজনগ্রাহ্য বাস্তবতার সঙ্গে অসংগতিপূর্ণ।' (*তত্ত্বসংগ্রহ*: ৪৯৮)।

তিনি আরও বলেন, বন্ধন ও বন্ধন-মুক্তি একই ব্যক্তির ক্ষেত্রে ঘটে কারণ তাদের প্রকৃতি একই। এক্ষেত্রে বন্ধন হলো আসক্তি আর বন্ধন মুক্তি হলো তা থেকে আলাদা হওয়া। উভয় ঘটনাই বস্তুর একই নিয়মের অধীনে ঘটে। বন্ধন ও বন্ধন মুক্তি একই বৈশিষ্ট্যের অধীন। শান্তরক্ষিতের এই মত থেকে ব্যক্তি সম্পর্কিত একটি ব্যবহারিক ধারণা পাওয়া যায়। তিনি মাধ্যমিক দার্শনিক হিসেবে ব্যক্তির সহজাত অস্তিত্ব অস্বীকার করলেও তাঁর মতে, বস্তুর নিয়মের ঐক্য ব্যক্তির একটি কার্যোপযোগী ধারণা দেয়।

স্মরণ, প্রত্যক্ষণ ও অনুসন্ধান ইত্যাদির সম্ভবপরতা সম্পর্কে শান্তরক্ষিতের যুক্তি হলো, ব্যক্তি নৈরাত্মিক হলেও স্মরণ ইত্যাদি ঘটনাগুলো ঘটে কার্যকারণের নিয়মে। তিনি বলেন: 'প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে, এটাই নিশ্চিত যে, কেবল কিছু নির্দিষ্ট ঘটনার বিশেষ কার্যকারিতা বা সামর্থ্য আছে অন্য কিছু ঘটনার সাপেক্ষে; ওই নির্দিষ্ট ঘটনাগুলোতেই কেবল কর্ম ও কর্মফলের সম্পর্ক সম্ভব হয়।' (*তত্ত্বসংগ্রহ*: ৫০৩)।

উল্লেখ্য যে, মাধ্যমিক দার্শনিকেরা কার্য-কারণের বাস্তবতাকে স্বীকার করেন এবং তাঁদের মতে, বিশেষ কারণই কেবল বিশেষ ফলাফলের জন্ম দেয়। এই জবাবের পরিপ্রেক্ষিতে আরেকটি অভিযোগ ওঠে এমন যে, বস্তুমাত্রই নৈরাত্মিক হওয়ায় কার্য-কারণের ঘটনাই সম্ভবপর নয়। নৈয়ায়িকেরা বলেন, জীবন্ত দেহে আত্মা বিদ্যমান বলেই নিশ্বাস-প্রশ্বাসের প্রক্রিয়া বিদ্যমান, অন্যদিকে ঘটের ক্ষেত্রে সেটা নেই, কাজেই তার আত্মাও নেই। মাধ্যমিকেরা এই অভিযোগের জবাবে বলেন, বস্তুর সহজাত অস্তিত্ব থাকলে, অর্থাৎ বস্তু নিজের অস্তিত্বের জন্য নিজ সত্তার উপর নির্ভরশীল হলেই বরং কার্য-কারণ অসম্ভব হতো এবং সমস্ত বস্তুজগৎ চিরায়ত অস্তিত্ব লাভ করত। শান্তরক্ষিত কার্য-কারণের অস্তিত্ব প্রসঙ্গে বলেন, বীজের ভেতরকার কার্যকারিতা যেভাবে চারাগাছ, বৃক্ষ ও ফলের জন্ম দেয়, এবং এটা ঘটে আত্মার উপস্থিতি ছাড়াই, তেমনই বস্তু জগতের ক্ষেত্রেও একই কথা সত্য। এই কার্য-কারণ প্রক্রিয়া মনোজগতেও বিস্তৃত। উভয় ক্ষেত্রেই নির্দিষ্ট কারণের উপস্থিতিতে নির্দিষ্ট কার্য বা ফল ঘটে। কিছু ফলাফল ভালো, কিছু মন্দ, কিছু সমর্থনযোগ্য কিছু নয়– এসবই ঘটতে থাকে মুহূর্তের পরম্পরায়।

ব্যক্তিসত্তাও এই কারণিক প্রবাহের অংশ। এ প্রসঙ্গে শান্তরক্ষিতের ব্যাখ্যা এরকম: যখন আমরা কোনো দৃশ্য দেখি, তার ফল হিসেবে তৈরি হয় স্মৃতি, যখন প্রত্যক্ষণের ফল হিসেবে সৃষ্টি হয় জ্ঞান, তা কারণ হিসেবে সৃষ্টি করে কোনো সিদ্ধান্ত; যেখানে অপেক্ষা আছে, তার ফলাফল হিসেবে আছে অপেক্ষার নিরসণ; যেখানে আগ্রহ আছে, তার ফলাফল হিসেবে আছে আগ্রহের নিবৃত্তি। এ ঘটনাগুলোর সঙ্গে বুদ্ধ কোনো

ঐক্যধর্মী ব্যক্তিসত্তাকে যুক্ত করেন নি। এসব ঘটনার প্রবাহটাই সত্য- এর থেকে যে ব্যক্তি বা কোনো কর্তাসত্তার ধারণা জন্মে তা নিছক কল্পনা।

শান্তরক্ষিত ব্যক্তির কর্তাসত্তা সম্পর্কে বলেন: 'কর্তা ও অন্য ধারণাগুলো তৈরি হয় বন্ধনের ঐক্যের সূত্রে। এটা কেবলই কল্পনার এক প্রকার উদ্ভাবন। এর পেছনে বাস্তবতা বলে কিছু নেই।' (*তত্ত্বসংগ্রহ*: ৫০৪)। অর্থাৎ শান্তরক্ষিতের মতে, বিশেষ কার্য-কারণ পরম্পরার মধ্যে যে ঐক্য আছে, তা থেকে ঐক্যধর্মী ব্যক্তির ধারণা জন্মে। এ থেকে মনে হয় যে, একই 'আমি' কাজটি করছি। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে 'আমি' বলে সহজাত কোনো সত্তা নেই। তবে শান্তরক্ষিত ব্যক্তিসত্তার ব্যবহারিক অস্তিত্বকে অস্বীকার করেন না।

মাধ্যমিক ধারার দার্শনিক অতীশ দীপঙ্কর তাঁর 'হৃদয় নিক্ষেপ' রচনায় দৃশ্যমান বাস্তবতার আবির্ভাব এবং এর সঙ্গে যুক্ত আমিত্বের ধারণা ব্যাখ্যা করেন। তিনি বলেন, 'বাস্তবতা উপলব্ধির কারণ হলো আমিত্বের বোধ' (অতীশ ২০০০: পৃ. ৩৭১)। মাধ্যমিকেরা যেহেতু বস্তুজগৎ এবং ব্যক্তিসত্তা– উভয়ের সহজাত অস্তিত্বকে অস্বীকার করেন, তাই 'আমি' নামক ধারণার কেবল একটা ব্যবহারিক অস্তিত্ব আছে। অতীশের মতে, 'আমি'র ধারণা কিছু শর্তের ভেতর দিয়ে সৃষ্ট। অন্যদিকে, এই 'আমি'র ধারণা দৃশ্যমান বাস্তবতা উদ্ভবের জন্য দায়ী। কারণ জ্ঞাতা হিসেবে 'আমি' জ্ঞেয়বস্তুকে আলাদা করার প্রধান শর্ত হিসেবে কাজ করে।

৫.

নব্য ন্যায় দর্শনে কালকে দেখা হয় একক, নিরাকার ও চিরায়ত দ্রব্য হিসেবে। যাবতীয় বস্তু এই চিরায়ত কালের আধারে অবস্থান করে কালিক সম্বন্ধের ভিত্তিতে (ড্যানিয়েল হেনরি হোমেস ইঙ্গলস ১৯৮৮: ৭৮)। নব্য নৈয়ায়িকেরা কালের মতো দেশকেও একক এবং অনন্ত হিসেবে দেখেন।

নব্য ন্যায় দার্শনিকেরা ক্ষণ, দিন, মাস, বছর ইত্যাদিকে বলেন খণ্ডকাল। কাল যেহেতু অনন্ত তাই খণ্ডকালকে তারা বলেন কালের উপাধি, অর্থাৎ কালের উপর আরোপিত বিশেষত্ব। নশ্বর বস্তুপুঞ্জের সঙ্গে এই খণ্ডকালের সম্বন্ধ হলো সাক্ষাৎ সম্বন্ধ, যেমন 'এই মাসে বৃষ্টি হয়েছে।' এখানে বৃষ্টির সঙ্গে এই মাসের সম্বন্ধ সাক্ষাৎ কালিক সম্বন্ধ। তারা পরোক্ষ কালিক সম্বন্ধকেও স্বীকার করেন, যেমন দুটো ঘটনা ক ও খ যখন খণ্ডকালের সঙ্গে সম্পর্কিত, তখন ক ও খ-এর মধ্যে একটা পরোক্ষ কালিক সম্বন্ধ সৃষ্টি হয়।

নব্য নৈয়ায়িকেরা জ্ঞানের বস্তু তথা প্রমেয়কে অর্থবোধক ভাষায় হাজির করার যুক্তিযুক্ত উপায় খুঁজেছেন। রঘুনাথ শিরোমণি তাঁর একটি বইয়ের নামকরণ করেন *পদার্থতত্ত্বনিরূপণ*। এখানে 'পদার্থ' মানে পদের অর্থ, অর্থাৎ ভাষিক পদ যে অর্থকে

নির্দেশ করে। কাজেই *পদার্থতত্ত্বনিরূপণ* অর্থ দাঁড়ায়, ভাষা দ্বারা নির্দেশিত বস্তুর স্বরূপ বিচার। বইটিতে নানা রকম প্রমেয় পদার্থের পাশাপাশি রঘুনাথ কাল নিয়েও আলোচনা করেন। এতে তিনি প্রাচীন নৈয়ায়িকদের কাল সম্পর্কিত ধারণা খণ্ডন করেন এবং এ সম্পর্কে নতুন মত দেন। বইটির শুরুতে রঘুনাথ বলেন:

> 'স্থান ও কাল ঈশ্বরপদার্থ ছাড়া অন্য কিছু নয়, যেহেতু এর বিপক্ষে কোনো প্রমাণ নেই। কেননা যেখানেই বিশেষ কোনো কার্যের উৎপত্তি ঘটে, এসব ঘটে বিশেষ কারণ সমূহের সঙ্গে ঈশ্বরপদার্থের যুক্ততার ভেতর দিয়ে। প্রাচীনপন্থীরাও একটি (মহা)দিক ও একটি (মহা)কাল থেকে পূর্ব-পশ্চিম ইত্যাদি খণ্ডিত দিক, ক্ষণ, দণ্ড, মুহূর্ত ইত্যাদির ব্যবহার স্বীকার করেন। (*পদার্থতত্ত্বনিরূপণ*: ১.৩–৩.১-২)

রঘুনাথ বৈশেষিক পদার্থশ্রেণির ধারণাকে ঢেলে সাজাতে গিয়ে স্থান ও কালকে একত্র করে ঈশ্বরপদার্থ নাম দেন। এখানে উল্লেখ্য যে, এই ঈশ্বর শব্দটি কোনো পরমাত্মা বা নরাত্মা আরোপিত ঈশ্বরকে নির্দেশ করছে না। দুটি পরিব্যাপক পদার্থকে একটিতে কমিয়ে আনাই ছিল রঘুনাথের উদ্দেশ্য এবং এতে যৌক্তিক কোনো বিভ্রান্তি ঘটে না। রঘুনাথের মত অনুযায়ী, আমরা যে কালিক ও স্থানিক ধারণাগুলো প্রকাশ করি, যেমন 'রহিম করিমের চেয়ে কনিষ্ঠ', কিংবা 'রাজশাহী ঈশ্বরদীর পশ্চিমে অবস্থিত'– এগুলো সম্ভব হয় যেসব পরিব্যাপক বিমূর্ত পদার্থের কারণে তা হলো দেশ ও কাল। এদেরকে একসঙ্গে তিনি বলেন ঈশ্বরপদার্থ। এখানে রঘুনাথ মহাকাল ও মহাস্থানের মধ্যে কোনো পার্থক্য করছেন না– উভয়েই ঈশ্বরপদার্থ। প্রশ্ন উঠবে, তাহলে স্থানিক ও কালিক ধারণার মধ্যে পার্থক্য হচ্ছে কীভাবে? উত্তর হলো, একই পরিব্যাপক সত্তা আলাদা বিমূর্ত সত্তা সমূহের দ্বারা অবচ্ছিন্ন (delimited) বলেই এদের মধ্যে ভিন্নতা, এছাড়া মূল সামান্য ধারণা একই পরিব্যাপক সত্তাকে নির্দেশ করে। যখন আমরা বলি, 'সভাপতি মহোদয় এখন আছেন'– এই অবধারণ সম্ভব হচ্ছে, খণ্ডকালের কারণে। অর্থাৎ মহাকাল এখানে বিশেষ কিছু বিমূর্তের দ্বারা অবচ্ছিন্ন। এই বিমূর্তগুলোই আসলে আলাদাভাবে অনন্যতা দেয় স্থানিক ও কালিক অবধারণকে।

রঘুনাথের এ অবস্থানের বিরুদ্ধে পাল্টা যুক্তি দেওয়া হয়েছে। কারণ নৈয়ায়িকেরা ঈশ্বরকে ব্যক্তি আত্মা থেকে ভিন্ন এক আত্মিক সত্তা বলে স্বীকার করেন। রঘুনাথ যেহেতু স্থান-কালকেই ঈশ্বরপদার্থ বলেন, কাজেই এরকম সর্বব্যাপী সত্তার সঙ্গে আরেক সর্বব্যাপী ঈশ্বর সত্তা সহ-অস্তিত্বশীল হয়ে পড়ে, যা অযৌক্তিক (পটার ১৯৫৭: ২৩)। তবে, রঘুনাথ ঈশ্বর বলতে কোনো সংবেদনশীল স্বয়ংসত্তার অস্তিত্বকে সম্ভবপর বলে স্বীকার করেন না।

স্থান ও কাল নামক দুটি পরিব্যাপক সত্তাকে অভিন্ন গণ্য করার ব্যাপারটি নতুন নয়। কোনো কোনো ভাষ্যকার বলেন, কণাদ নিজেও এই বিমূর্ত সত্তাগুলোকে

পরস্পরের সঙ্গে অভিন্ন ভাবতেন (পটার: ২৫)। শিবাদিত্য তাঁর *সপ্তপদার্থী* বইয়েও স্পষ্টভাবে বলেন, স্থান-কাল ও আকাশ (ঈথার)– এই তিন প্রকার বিমূর্ত সত্তা প্রকৃতপক্ষে একই, এরা আলাদা হয় কেবল অবচ্ছিন্ন হবার আলাদা শর্তগুলো দিয়ে (পটার: ২৫)। অবচ্ছিন্নতার শর্তগুলোর কারণে স্থানিক ও কালিক অবধারণের মধ্যে যে পার্থক্য তৈরি হয়, রঘুনাথ তা স্বীকার করেন। তিনি বলেন:

> 'পরত্ব, অপরত্ব (কাছে-দূরে) ইত্যাদি সংযোগ ভিন্ন অন্য কোনো গুণ নয়। কেননা এসব অবধারণকে কেউ ব্যাখ্যা করতে পারে নৈকট্য ও দূরত্ব দিয়ে, এবং (অন্যদিকে) কালিক জ্যেষ্ঠত্ব ও কনিষ্ঠত্ব দিয়ে। এদের মধ্যে স্থানিক অবধারণগুলোতে (কাছে-দূরে) তৃতীয় পদের উপস্থিতি থাকে, কিন্তু কালিক অবধারণে (জ্যেষ্ঠ-কনিষ্ঠ) থাকে পারস্পরিকতার সম্পর্ক; এটাই দুই ধরনের অবধারণের ভেতরকার পার্থক্য। (*পদার্থতত্ত্বনিরূপণ*: ২৯.৪–৩০.২)

অর্থাৎ দূরত্ব বা নৈকট্য প্রকাশ করে এমন দৈশিক অবধারণগুলোর মূলে আছে বিশেষ ধরনের যোগাযোগ। এরা যোগাযোগের গুণ প্রকাশ করে। রঘুদেব বিষয়টি ব্যাখ্যা করেন এভাবে: 'কাশী থেকে মথুরা প্রয়াগের তুলনায় দূরে'– এই বিবৃতিতে বলা হচ্ছে, মথুরা ও কাশীর মধ্যে আরও যোগাযোগের স্থান আছে, যার তুলনায় মথুরা থেকে কাশী দূরবর্তী। এখানে কাশী ও মথুরার মাঝখানে প্রয়াগের উপস্থিতি দূরত্বের ধারণাটিকে স্পষ্ট করছে। অন্যদিকে, কালিক দূরত্ব পারস্পরিক, যেমন করিম রহিমের চেয়ে কনিষ্ঠ হলে, রহিম করিমের চেয়ে জ্যেষ্ঠ হবে। স্থানিক অবধারণের ক্ষেত্রে এই পারস্পরিকতা নেই। কেননা, ক যদি খ থেকে দূরে হয়, তাহলে খ থেকে ক কাছে, এমন বলা যাবে না।

রঘুনাথ বলেন, 'ক্ষণ পদার্থ অন্যান্য দ্রব্য থেকে অতিরিক্ত, অথচ ক্ষণস্থায়ী। এটি হচ্ছে কালের উপাধি' (*পদার্থতত্ত্বনিরূপণ*: ৫৮.৪)। এখানে উপাধি হলো আরোপিত গুণ, যেমন পাহাড়ে সূর্যালোক। একইভাবে ক্ষণ হলো কালিক অবধারণগুলোতে কালের উপাধি। রঘুনাথ ক্ষণকে ক্ষণস্থায়ী বলার মাধ্যমে বৈশেষিকদের ৭ রকম দ্রব্য থেকে ক্ষণকে আলাদা বৈশিষ্ট্যের বলে চিহ্নিত করেন। তাছাড়া, 'ক্ষণ' যদি ক্ষণস্থায়ী না হতো, তবে ঘট সৃষ্টির আগের মুহূর্তেও 'ঘট আছে' এমন ব্যাপার ঘটত।

ন্যায়-বৈশেষিক দার্শনিকদের মতে, কালিক অবধারণের প্রতিযোগিতা অবচ্ছেদক হলো ক্রিয়া বা গতি (পটার: ৭৩)। অর্থাৎ ক্রিয়া এবং গতির কারণেই কাল অস্তিত্ব লাভ করে। ক্রিয়াকে তারা পদার্থশ্রেণির তৃতীয় পদার্থ হিসেবে স্বীকার করেন। এক্ষেত্রে রঘুনাথ ভিন্নমত দেন। তিনি ক্রিয়াকে 'ক্ষণ' বলতে নারাজ।

রঘুনাথ ‘ক্ষণ’কে বলেছেন কালের উপাধি। যদি কয়েকটি বস্তুর উপর টর্চের আলো ঘুরিয়ে আনা হয়, তবে প্রতিটি বস্তুর উপর আলো পড়ার মুহূর্তটি একেকটি ক্ষণ। এই ক্ষণগুলো কালকেই বিশেষায়িত করে।

কার্ল এইচ পটার তাঁর ব্যাখ্যায় ভাষ্যকার দিনকরের ভাষ্যকে আমলে নিয়েছেন। বিশ্বনাথ ন্যায়-পঞ্চানন এই ক্ষণগুলোকে তালিকাবদ্ধ করেছেন এভাবে:

প্রথম ক্ষণ: ধরা যাক, খ থেকে গ-এর দিকে এগোচ্ছে ক নামক একটি বস্তু। এখানে প্রথম ক্ষণ হলো, যখন বস্তুটি খ কে ছেড়ে যাবার উপক্রম করছে। এই মুহূর্তটিকে নৈয়ায়িকেরা ব্যাখ্যা করেন এভাবে যে, খ থেকে গ-এর বিভাগ (disjunction) যা ক্রিয়ার দ্বারা উৎপন্ন, এখনো সৃষ্টি হয়নি, অর্থাৎ খ-এর আলাদা হবার ঘটনাটি যেখানে অনুপস্থিত, নৈয়ায়িকেরা যাকে *বিভাগের প্রাগভাব* (prior absence of disjunction)) বলেন। অর্থাৎ প্রথম ক্ষণটি হলো, কোনো ক্রিয়ার নিজের দ্বারা উৎপন্ন বিভাগের প্রাগভাব বিশিষ্ট ক্রিয়া। দ্বিতীয় ক্ষণ: এটি হলো সেই ক্ষণ, যখন ক, খ-কে ছেড়ে যায়নি, তবে উভয়ের মধ্যে বিভাগটি সৃষ্টি হয়েছে। তৃতীয় ক্ষণ: এই ক্ষণে ক বস্তুটি খ-কে ছেড়ে গেছে (পূর্ববর্তী স্থানের সঙ্গে সংযোগের বিনাশ ঘটেছে), কিন্তু তা এখনো গ-তে পৌঁছায়নি। চতুর্থ ক্ষণ: এই ক্ষণে ক বস্তুটি খ থেকে গ-তে পৌঁছে গেছে। প্রাচীন তাত্ত্বিকদের মতে, এসব ক্ষণের প্রতিটিকেই বলে ক্রিয়া, যা কালকে নির্দেশ করে।

পুরনো নৈয়ায়িকেরা এই চারটি ক্রিয়াকে চারটি ক্ষণ বলে গণ্য করেন। এই অবস্থানের বিরুদ্ধে গিয়ে রঘুনাথ বলেন, উল্লেখিত চারটি ক্রিয়ার কোনোটিতেই ক্ষণত্ব (momontariness) প্রতিষ্ঠা করা যায় না। কেননা প্রথম ক্রিয়াটিকে, অর্থাৎ বিভাগ সৃষ্টির আগে যেটি ঘটে তার পরের ক্রিয়াটি বহু বছর পরেও ঘটতে পারে, সেক্ষেত্রে ক্রিয়া ছাড়াই কালের অস্তিত্বকে ব্যাখ্যা করতে হবে।

রঘুনাথ এ সমস্যা দেখানোর পর প্রাচীনপন্থীরা বলেন, ক্রিয়া নিজেই বিভাগটির উদ্ভব ঘটাচ্ছে এবং সেই বিভাগবিশিষ্ট ক্রিয়াটিই ক্ষণ। এর জবাবে রঘুনাথ বলেন:

> যদি তুমি বলো, ক্ষণ হলো সেই ক্রিয়া যা নিজেই বিভাগটি সৃষ্টি করে,
> আমি বলব, না!
> কেননা এভাবে ক্ষণপদার্থ নিরূপণ করা হলে ক্রিয়ার পক্ষে নিজেকে পুনরাবৃত্তি করতে হবে,
> কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তা পুনরাবৃত্তিমূলক নয়।’ (*পদার্থতত্ত্বনিরূপণ*: ৫৯.৩–৫)

এখানে রঘুনাথ বলছেন, প্রাচীনপন্থীদের ব্যাখ্যাটি মানা যেত যদি ক্রিয়ার নিজের মধ্যে কোনো পুনরাবৃত্তিমূলক গুণ থাকত। তাহলে অসংখ্য ক্রিয়া মিলে সময়ের স্রোত তৈরি করছে, এমন বলা যেত। কিন্তু বাস্তবে ক্রিয়াকে পুনরাবৃত্তিমূলক হিসেবে দেখা যায় না।

এভাবে রঘুনাথ দেখান, প্রাচীনপন্থীরা ক্রিয়ার যে চার ধরনের ক্ষণ চিহ্নিত করেন, তার কোনোটাতেই 'ক্ষণত্ব'কে প্রতিষ্ঠা করা যায় না। এমনকি ওই ক্ষণগুলোর সন্নিবেশের মধ্যেও ক্ষণত্বকে প্রতিষ্ঠা করা যায় না। কাজেই রঘুনাথের সিদ্ধান্ত হলো, 'ক্ষণ' ভাব ও অভাব পদার্থগুলো থেকে অতিরিক্ত এক সরল পদার্থ। এই ক্ষণপদার্থ গুণ বা ক্রিয়া নয়।

রঘুনাথ পরবর্তী নব্য ন্যায় দার্শনিক বিশ্বনাথ ন্যায়-পঞ্চানন বলেন, চলমান বস্তুর সঙ্গে অন্য বস্তুর যে সম্বন্ধ সেটাই কাল। একারণে তাঁর মতে, কাল হলো বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের ভিত্তি। তিনি বলেন, 'এখন ঘট' এই প্রত্যক্ষণের ভিত্তি হলো আপাত ঘূর্ণমান সূর্যের সঙ্গে ওই ঘটের সম্বন্ধ (বিশ্বনাথ ১৯৭৭: ৬১-৬২)। ন্যায়-পঞ্চানন মনে করেন, পূর্ববর্তী-পরবর্তী ইত্যাদি ধারণার অসমবায়ী কারণ হলো কাল, অর্থাৎ কালের ভিত্তিতেই আমরা পূর্ববর্তী ও পরবর্তীর মধ্যে সংযোগ প্রতিষ্ঠা করি। একইভাবে কাছে-দূরে ইত্যাদি ধারণার ভিত্তি হলো দেশ।

ভাষাচিহ্নিত জগৎকে সহজবোধ্য করার জন্য রঘুনাথ শিরোমণির মতো ন্যায়-পঞ্চাননও কালকে একটি সরল দ্রব্য হিসেবে দেখেছেন। তাঁর মতে, কাল অখণ্ড হলেও একে আমরা ক্ষণ, দিন, মাস ইত্যাদিতে ভাগ করি এতে ভিন্ন ভিন্ন বিশেষত্ব আরোপের মাধ্যমে, যেমন কোনো বস্তু ক স্থান থেকে খ-তে পৌঁছার সময় যে ক্রিয়ার মাধ্যমে একটি বিভাগ সৃষ্টি হয় ওই ক্রিয়া দিয়ে চিহ্নিত হতে পারে বিভাগপূর্ব একটি ক্ষণ।

নব্য নৈয়ায়িকদের কালচেতনা অনুযায়ী ব্যক্তিসহ নশ্বর সব বস্তু কালিক সম্বন্ধের ভিত্তিতে অনন্ত কালের আধারে অবস্থান করে। তবে তাদের খণ্ডকালের ধারণা নশ্বর সত্তার সঙ্গে সম্বন্ধের ভিত্তিতে স্রেফ আপেক্ষিক অস্তিত্ব লাভ করেছে। কেননা নশ্বর সত্তাগুলোই এই খণ্ডকালকে অস্তিত্বশীল করে তোলে।

আত্মসত্তা সম্পর্কে রঘুনাথ বলেন, আত্মত্বের (selfhood) সামান্য লক্ষণ প্রযুক্ত হতে পারে এমন কিছুর ক্ষেত্রে যাতে সুখ-দুঃখ ইত্যাদি লক্ষণ পরিলক্ষিত হয় (পদার্থতত্ত্বনিরূপণ: ৪৪.২)। অর্থাৎ ইন্দ্রিয় সংবেদন ও মানসিক ক্রিয়ার কারণে যে সংবেদনগুলো অনুভূত হয় সেগুলোই আত্মসত্তার নির্দেশক। তিনি মনে করেন, ঈশ্বরে ব্যক্তিসত্তা আরোপ করা যায় না কারণ তিনি সুখ-দুঃখ অনুভব করেন না। রঘুনাথ এমনও মনে করেন না যে, ব্যক্তিসত্তা তার অস্তিত্বের জন্য কোনো পরমাত্মার উপর নির্ভরশীল। কাজেই রঘুনাথের মতে, স্থান-কালের পক্ষে ঈশ্বরপদার্থ হতে কোনো যৌক্তিক অসঙ্গতি নেই।

৬.

বাউলেরা দেহাতীত কোনো অভৌত সত্তার অস্তিত্ব স্বীকার করেন না। তারা যে মহাভাব বা আলেক সাঁই-এর কথা বলেন সেই নিরাকার সত্তা দেহনির্ভর। বাউলদের

কালচেতনাও দেহ বা দেশকেন্দ্রিক। দেহের বর্তমানই তাদের কাছে একমাত্র সময়। ফকির লালন সাঁই তাঁর একটি গানে বলেন:

সহজ মানুষ ভজে দেখ না রে মন দিব্যজ্ঞানে,
পাবি রে অমূল্য নিধি বর্তমানে।
ভজ মানুষের চরণ দুটি
নিত্যবস্তু হবে খাঁটি।
মরিলে সকল মাটি
এ ভেদ ত্বরায় নেও জেনে। (লালন ফকির ১৯৯৩: ৯৮)

এ গান থেকে মনে হতে পারে 'বর্তমান' বলতে লালন ইহকালকে বুঝিয়েছেন। কেননা এতে বলা হচ্ছে, মৃত্যু হলে সব মাটি হয়ে যাবে। মৃত্যুর পর বেহেশত পাওয়া যেতে পারে বটে, তবে সেটা অনুমান মাত্র। প্রত্যক্ষণ লব্ধ সত্য তো এই যে, মানুষের দেহ মাটিতে মিশে যায়। কাজেই লালনের কাছে প্রত্যক্ষলব্ধ সত্যই একমাত্র সত্য, বর্তমান কালই একমাত্র কাল, যা অর্থবহ এবং সেই কাল ততক্ষণ পর্যন্ত সত্য, যতক্ষণ দেহ আছে। এ দেহেই আছে 'আলেক সাঁই' বা 'সহজ মানুষ' যার সাধন-ভজন করতে বলছেন লালন। দেহকে আশ্রয় করে এই মহাভাবের বসবাস, দেহের বিকাশ ধরে তার বিকাশের শর্তও তৈরি হয়।

ফকির লালন তাঁর অন্য একটি গানে বলেন:

সময় গেলে রে ও মন সাধন হবে না।
দিন থাকিতে দিনের সাধন
কেন জানলে না॥

জান না মন খালে বিলে
মীন থাকে না জল শুকালে
কি হয় তারে বাঁধাল দিলে
শুকনা মোহনা। (লালন ফকির ১৯৯৫: ২৩৪)

বর্তমান কেন্দ্রিক কালচেতনা এ গানেও স্পষ্ট। লালন বলছেন, এই বর্তমানকে হেলায় হারালে অসময়ে খেটে মরাই সার হবে, তাতে ফল ধরবে না। শুকনো মৌসুমে যেমন খালে বিলে মীন থাকতে পারে না, তেমনই উপযুক্ত সময়টাকে হারালে শুকনো মোহনায় বাঁধ দেওয়ার মতো অবস্থা হবে।

বাউলদের কাছে কাল দেহনির্ভর হওয়ায় ব্যক্তি অবস্থান করে এক আপেক্ষিক কালের জগতে। সেই কাল সদাবর্তমান। তবে বাউলদের দেহকেন্দ্রিক কালচেতনার একটি বিশ্বতাত্ত্বিক মাত্রা আছে। তারা মনে করেন, আকারের (রূপ/দেহ) ভেতর দিয়ে বয়ে চলেছে নিরাকারের প্রবাহ। এখানে নিরাকার অর্থ মহাভাব, সূফিমতসহ বাংলার

জনদর্শনে যাকে বলা হয়েছে নিরঞ্জন। লালন ফকির বলেন, 'নিরাকার রয় অচিন দেশে, আকার ছাড়া চলে না সে (১৯৯৩: ১২৪)। অর্থাৎ মানবদেহকে আশ্রয় করে আছে এই নিরাকার নিরঞ্জন। এটি বয়ে চলেছে প্রতিটি ব্যক্তির ভেতর দিয়ে। লালন তাঁর অন্য একটি গানে বলেন, 'একে বয় অনন্তধারা/ তুমি আমি নাম বেওয়ারা।' (১৯৯৫: ২১০) অর্থাৎ 'আমি' 'তুমি' বলে ব্যক্তির ভেদ করা হলেও উভয়ের নামের আড়ালে চলছে একই মহাভাবের প্রবাহ।

ফকির লালন সাঁই ব্যক্তির জৈবসত্তার পাশাপাশি তার কর্তাসত্তাকে অন্বেষণ করতে বলেন। কারণ ব্যক্তি কর্ম দ্বারা তার জৈবসত্তার ভেতর থাকা ভাবসত্যকে বস্তুর সত্যে রূপ দিতে পারে। লালন বলেন:

কর্তারূপের নাই অন্বেষণ
আত্মারূপের হয় নিরূপণ
আপ্ততত্ত্ব নাই আলিঙ্গনে
সহজ সাধক জেনো॥

দিব্যজ্ঞানী যে জন হল
নিজতত্ত্বে নিরঞ্জন পেল
সিরাজ সাই কয় লালন র'ল
জন্ম-অন্ধ মন গুণে॥ (লালন ফকির ১৯৯৩: ২৩৬)

অর্থাৎ কেবল আত্মারূপ বা জৈব সত্তা দিয়ে ব্যক্তিকে নিরূপণ করা যাবে না, পাশাপাশি কর্তারূপের অন্বেষণও করতে হবে। কেননা নিজের ভেতর নিরঞ্জনকে খুঁজে পেতে হলে কর্মের ভেতর দিয়ে খুঁজতে হবে।

৭.

আমরা দেখতে পাচ্ছি, বৌদ্ধমতের বিভিন্ন ধারা, নব্য ন্যায় এবং বাউল দর্শনে দেশ-কালের ধারণা আলাদা। দেশ ও কালচেতনার এই ভিন্নতা তাদের ব্যক্তিসত্তা সম্পর্কিত বিশ্বাসেও ভিন্নতা সৃষ্টি করেছে। বৌদ্ধ দর্শনের ভাববাদী ধারা হিসেবে পরিচিত যোগাচারবাদীরা চেতনাকে একমাত্র সত্য হিসেবে স্বীকার করেন। বস্তুসত্তার সহজাত অস্তিত্ব স্বীকার করেন না বলে তাদের দেশ-কালের ধারণা বস্তুনির্ভর নয়, বরং চেতনানির্ভর। চেতনার ভেতর সত্তার উদ্ভব ও বিলয়ের যে পরম্পরা, সেটাই কাল। কাজেই তাদের মতে, প্রতীত্যসমুৎপাদ থেকে কাল-পরম্পরার ধারণা জন্মায়। অন্যদিকে, মাধ্যমিক দার্শনিকেরা প্রতীত্যসমুৎপাদকে দেখেন সত্তার পরম্পরাপেক্ষতা হিসেবে। অর্থাৎ যেকোনো সত্তা অন্য সত্তা বা সত্তাসমূহের ওপর নির্ভরশীল হয়ে নিজেদের অস্তিত্ব রক্ষা করে। তাদের যুক্তি এই যে, বস্তু স্বতন্ত্র বা স্বনির্ভর হলে

পরিবর্তন বা অনিত্যতা বলে কিছু থাকত না এবং কালের ধারণাও সৃষ্টি হতো না। মাধ্যমিকেরা কোনো চূড়ান্ত সত্তার অস্তিত্ব স্বীকার না করলেও চেতনা ও জড়বস্তুর ব্যবহারিক অস্তিত্ব এবং এদের কারণিক তাৎপর্যকে অস্বীকার করেন না। এমনকি ইন্দ্রিয়লব্ধ ব্যবহারিক জগৎকে তারা বৈধজ্ঞানের উপায় বলে মনে করেন। এজন্য তাদের মতকে ব্যবহারিক বাস্তববাদ বলা হয়ে থাকে। সহজিয়া বৌদ্ধমতে উভয় ধারার প্রভাব লক্ষ করা যায়, যেমন লুইপা কালকে দেখেছেন চেতনার প্রবাহ হিসেবে, কিন্তু এই কালজ্ঞানের ভিত্তি দেহ তথা ইন্দ্রিয়জ্ঞান।

নব্য নৈয়ায়িকদের মতে, দেশ-কাল চিরায়ত ও অনন্ত দ্রব্য। সব নশ্বর সত্তা এদের সঙ্গে কালিক ও দৈশিক সম্বন্ধের ভেতর অবস্থান করে। রঘুনাথ শিরোমণির মতে, ক্ষণকে ক্রিয়া দিয়ে বোঝা সম্ভব নয়। কারণ ক্রিয়া নিজে পুনরাবৃত্তিমূলক নয়। কাজেই তাঁর বিবেচনায় আপেক্ষিক কালের ধারণা যুক্তিসম্মত নয়। কাল চিরায়ত বা পরম।

বাউলদের কালের ধারণা দেশ বা দেহনির্ভর। দেহের 'বর্তমান'ই তাদের কাছে একমাত্র কাল। বর্তমান থেকে অতীত বা ভবিষ্যৎ অনুমান করা হয়। কিন্তু অনুমান প্রমাণে বাউলদের আস্থা নেই। তাদের দেহনির্ভর কালচেতনা আপেক্ষিক ও আত্মগত।

বুদ্ধ নৈরাত্মবাদ ও অনিত্যবাদ স্বীকার করায় বেশির ভাগ বৌদ্ধ সম্প্রদায় ধ্রুব আত্মার ধারণা স্বীকার করেন না। তবে বাৎসিপুত্রীয় এবং সম্মিত্তীয় সম্প্রদায় 'পুদ্গাল' বলে ব্যক্তিসত্তার মধ্যে এমন কিছুকে স্বীকার করেন যা নিত্য। এই পুদ্গালের ধারণায় তারা পৌঁছেছেন, কারণ কোনো নিত্য সত্তা ছাড়া কর্ম, কর্মফল, বন্ধন, বন্ধনমুক্তি কার ক্ষেত্রে ঘটে তা ব্যাখ্যা করা যায় না। যোগাচারবাদীরা যে ব্যক্তিকে অবাস্তব হিসেবে দেখেন এমন নয়। ব্যক্তিসত্তা তাদের কাছে পরতন্ত্র স্বভাব, পরিকল্পিত স্বভাব নয়। পরতন্ত্র স্বভাব সৃষ্টি হয় কারণ ও শর্তের মাধ্যমে। স্কন্ধগুলোর ঐক্য থেকে আমিত্বের বোধ জন্মে। আবার স্কন্ধবিয়োগ ঘটলে 'ব্যক্তি' বা 'আমি'র কোনো অস্তিত্ব থাকে না। কাজেই এটি একটি নির্মিত ধারণা। এই ধারণার বিনির্মাণ হলে তা পরিনিষ্পন্ন স্বভাব লাভ করে। সহজিয়ারা একে তুলনা করেন ঢেউ ও সমুদ্রের সঙ্গে। কারণ ও শর্ত থেকে এই ঢেউয়ের জন্ম হলেও পরিণামে তা সমুদ্রে বিলীন হয়ে যায়। মাধ্যমিক ধারার বৌদ্ধদের মধ্যে ব্যক্তিসত্তার ধারণা অন্য ধারাগুলো থেকে খুব আলাদা নয়। অন্যদের মতো মাধ্যমিকেরাও ব্যক্তির কর্তৃভাব স্বীকার করেন না। তারা বিশ্বাস করেন, প্রতীত্যসমুৎপাদ বা কালিক প্রবাহের মধ্যে স্কন্ধগুলোর ঐক্য থেকে 'আমি'র বোধ জন্মায়। কারণ ও শর্ত থেকে জ্ঞাতা-জ্ঞেয়, আমি-তুমি ইত্যাদি বিকল্পের ধারণা আসে। অর্থাৎ ব্যক্তি নিজেও কালপ্রবাহের অংশ। এগুলো 'আমি' সম্পর্কে বৌদ্ধ ধারাগুলোর সাধারণ মত। তবে মাধ্যমিক দার্শনিক শান্তরক্ষিত 'আমি'র সহজাত অস্তিত্ব স্বীকার না করলেও এর কার্যকারিতা মেনে নেন। পাশাপাশি জড়জগৎ থেকে পাওয়া ব্যক্তির জ্ঞানের বৈধতাও স্বীকার করেন।

নব্য নৈয়ায়িক রঘুনাথ শিরোমণি 'আত্মত্ব'কে সংজ্ঞায়িত করেন সুখ-দুঃখ ইত্যাদি অনুভব দিয়ে। ঈশ্বর যেহেতু সুখ-দুঃখ অনুভব করেন না তাই ঈশ্বর ব্যক্তি নয়। তাদের মতে, অন্যান্য নশ্বর সত্তার মতো ব্যক্তিসত্তাও চিরায়ত দেশ-কালের আধারে দৈশিক ও কালিক সম্বন্ধের ভিত্তিতে অবস্থান করে।

বাউল দর্শনের বিশেষত্ব এখানে যে, এতে ব্যক্তিসত্তার কর্তৃভাব স্বীকার করা হয়। কারণ বাউল মতে মানবদেহে আছে নিরাকার মহাভাবের অবস্থান। এই মহাভাব দেহে বিরাজ করে কর্তা রূপে। যাকে চিনতে না পারার কারণে 'আমি'র আরেকটি মাত্রা সৃষ্টি হয়। এই দ্বিতীয় 'আমি' অবিদ্যাজাত। সে যখন নিজের ভেতর সেই কর্তারূপকে আবিষ্কার ও উপলব্ধি করে, তখন ব্যক্তিসত্তার ইতিবাচক পরিবর্তন ঘটে কিংবা তার 'সাধন সিদ্ধ হয়'।

গ্রন্থপঞ্জি

দীলিপকুমার মোহান্ত (২০১৭), *কতিপয় দুর্লভ বৌদ্ধগ্রন্থ* (নাগার্জুন ও বসুবন্ধু বিরচিত), মহাবোধি বুক এজেন্সি, কলকাতা।

নীহাররঞ্জন রায় (১৯৯২), 'গ্রীক ও ভারতীয় কালচেতনা সম্বন্ধে', *ইউরোকেন্দ্রিকতা ও শিল্প সংস্কৃতি*, (সম্পাদনা) অঞ্জন সেন, বীরেন্দ্র চক্রবর্তী, উদয় নারায়ণ সিংহ, গ্রন্থালয় প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা।

লালন ফকির (১৯৯৩), *লালন সঙ্গীত: প্রথম খণ্ড*, (সম্পাদনা: ফকির আনোয়ার হোসেন (মন্টু শাহ)), লালন মাজার শরীফ ও সেবা-সদন কমিটি, কুষ্টিয়া।

(১৯৯৫), *লালন সঙ্গীত: দ্বিতীয় খণ্ড*, (সম্পাদনা: ফকির আনোয়ার হোসেন (মন্টু শাহ)), লালন মাজার শরীফ ও সেবা-সদন কমিটি, কুষ্টিয়া।

Atisa Sri Dipamkara Jnana (2000), *The complete works of Atisa* (Translated and annotated by Richard Sherburne, S.J.), Aditya rakashan, New Delhi.

Daniel Henry Holmes Ingalls (1988), *Materials for the study of navya-naya logic*, Motilal Banarsidass, Delhi.

Shantaraksita (1937), *The tattvasangraha of Shantaraksita: with commentary of Kamalashila*, (Trans. Ganganath Jha), Oriental institute, Baroda, India.

Nagarjuna (1995), *The fundamental wisdom of the middle way: Nagarjuna's Mulamadhyamakakarika*, (Trans. Jay L. Garfield), Oxford University Press, Oxford.

Karl H. Potter (1957), *The Padarthatattvanirupanam of Raghunath Siromani*, Harvard University Press, London.

Vasubandhu (1980), *Vijnapti-matrata-siddhi* (with Sthirmati's commentary), (Trans. K N. Chatterjee), Kishor Vidya Niketan, Varanasi.

Victor Mansfield (1998), 'Time and Impermanence in Middle Way Buddhism and Modern Physics', (a talk at the Physics and Tibetan Buddhism Conference University of California, Santa.

Barbara January 30-31), *BuddhaZine*, Link: http://www.buddhanet.net/timeimpe.htm Date: 20/01/2021c.

Visvanatha Nyaya-Pancanana (1977), *Bhasa Pariccheda with Siddhanta Muktavali*, Advaita Ashrama, Calcutta.